Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.156-163
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উনবিংশ শতাব্দীর আইনী সংস্কার ও বঙ্গমহিলা সমাজের প্রতিক্রিয়া: প্রসঙ্গ বিধবা বিবাহ আইন

নীলাঞ্জনা পাত্র
এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The most fascinating aspect of nineteenth century Bengal was its social cum legal reforms and its impact was most felt in the lives of Bengali women. Though it was unfortunate that neither the British administrators nor the Indian reformers felt the necessity to seek the view of Bengali women in this regard. But that does not mean that all of them were totally ignorant of such socio-legal reforms. Hindu Widow Remarriage Act of 1856 was one of those pathbreaking socio-legal reforms. Many Bengali women of that time responded to the above mentioned law in their own way. Most of these women were very ordinary, semi-educated or uneducated. They did or thought to do something that many educated women of contemporary aristocratic families did not dare to say or do. In this essay an initiative has been taken to pay attention to the activities of those unknown but brave women. Though all of the contemporary women were unaware or unwilling to adopt the new legislation, sometimes fear of obloquy and sometimes superstitious mind played a big role in this case. Therefore, both types of mentality has been included in this discussion through which it will be possible to get a comprehensive idea of the views of women of the Act XV of 1856 and its implementation.

Key words: Hindu Widow Remarriage Act, Bengali women, Women's views, Nineteenth Century.

উনিশ শতকীয় বাংলার সামাজিক কুসংস্কার সমাজের যেই অংশকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল এবং যাঁদের উন্নতির লক্ষ্যেই আইনী সংস্কারের সংকল্প ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় সমাজসংস্কারকরা অনুভব করেছিলেন, সেই নারীসমাজের উল্লিখিত বিষয়ে মনোভাব কি ছিল তা যথেষ্ট মনোগ্রাহী একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলার সকল মহিলা তাঁদের আত্মজীবনী লিখে যাননি, কিন্তু নিজ জীবন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ না করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে বিবিধ আইন পাশ হয়েছিল বা পাশ করানোর উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তথা বাংলার অনেক সাধারণ, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মহিলা কর্তৃক নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। তাঁরা এমন কিছু করেছিলেন বা করার কথা ভেবেছিলেন যা সমসাময়িক বহু উচ্চবিত্ত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত নারীও বলার বা করার সাহস দেখাননি। তাই

সেইসব অখ্যাতনামা অথচ সাহসী মহিলাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিদানের সময় এসেছে। সেকারণেই বর্তমান প্রবন্ধে ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ আইনের প্রেক্ষিতে বঙ্গমহিলারা তাঁদের বিবিধ কার্যসূচীর দ্বারা কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোকপাতের এক চেষ্টা গৃহীত হয়েছে। তবে পুরুষদের সকলেই যেমন সংস্কার বা প্রগতিশীলতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেননি তেমনি নারীসমাজেও কিন্তু অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন সমাজ সংস্কারক ও ঔপনিবেশিক সরকারের মিলিত প্রয়াস তথা আইনী পদক্ষেপের আবার কেউ কেউ এই আইন বা আইনের প্রয়াসকে মহিলাদের জীবনধারা পরিবর্তনের এক আশার কিরণ হিসেবে দেখেছিলেন। তাই আলোচনায় দুধরণের মানসিকতাই স্থান পাবে যার মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক ১৮৫৬ সালে প্রণীত পঞ্চদশ আইন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্গ মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশের পর প্রথম বিধবা বিবাহ হয়েছিল কালীমতি দেবী ও শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে। আইন প্রণয়নের পর প্রথম বৈধ বিধবা বিবাহের জন্য যেমন এই বিবাহটি তৎকালীন সমাজে বেশ চর্চিত হয়েছিল তেমনই এই বিবাহের ফলে রক্ষণশীল সমাজের ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল অপর একটি কারণেও। বিধবা কালীমতিকে সম্প্রদান করেছিলেন তাঁর মা লক্ষ্মীমণি দেবী, যা সমসাময়িক সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও সেই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এক প্রাচীনা, অশিক্ষিতা, গ্রাম্য রমণী যে কিনা নিজ বিধবা কন্যার বিবাহের আয়োজনের 'স্পর্ধা' দেখানোর সাথে সাথে, সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কন্যাকে নিজে সম্প্রদান করেছিলেন তা যে কম প্রশংসনীয় কাজ ছিলনা তা মানতে সমালোচকরাও বাধ্য হবেন।[১] মুক্তকেশী নামের এক বিধবা নিজের প্রথম পক্ষের ১২/১৩ বছর বয়স্কা এক কন্যা থাকার পরেও যেভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহের দ্বারা নিজ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার দ্বারা তিনি কেবল প্রথম সন্তানসহ বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেননি, বরং তাঁর সময়ের চেয়ে তিনি অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন ঐ কার্য্যের মাধ্যমে যা হয়তো একবিংশ শতকেও কোন বিধবা ভাবতে পারেননা সচরাচর।[২] এডুকেশন গেজেটের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, এক ভদ্র পরিবারের ব্রাহ্মবাবু বিধবা যুবতীকে শিক্ষা দেওয়ার নাম করে নিজ গৃহে এনে রাখার কিছুদিন পরেই সেই বিধবা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে নিজ সম্মান ও সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সেই ব্রাহ্ম 'ভদ্রলোক' মাসিক দশ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে সদ্য জন্মানো পুত্র ও সেই বিধবাকে কাশী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিন পর সেই টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেলে সেই বিধবা পাবনায় ফিরে এসে ব্রাহ্ম বাবুর নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ দাবী করলে ব্রাহ্ম 'ভদ্রলোক' তা না দেওয়ায় সেই বিধবা বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।[৩] অনুরূপ আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল শান্তিপুরে। সেখানকার এক ব্রাহ্মণ যুবক উক্ত স্থানের এক সৎকুলস্থা বিধবাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসেন, কিন্তু পড়ে বিবাহে অস্বীকৃত হন। ফলে সেই বিধবা যুবকের বিরূদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে অভিযোগ করেছিলেন যেখানে তিনি জানান- "যুবা আমাকে বিবাহ করণেচ্ছায় সবকুল বহির্গত করিয়াছে, এইক্ষণে বিবাহ না করিলে আমি সকল কুল পরিত্যক্তা হই। অতএব যুবা আমাকে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখুন নতুবা জাতিনাশ জন্য আমাকে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা দান করুন।" একথা বলে তিনি ঐ যুবকের নামে বাস্তবিকই চল্লিশ হাজার টাকার দাবীতে অভিযোগ করেছিলেন যাতে ঐ বিধবারই জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] বিধবা বিবাহ আইনের পর বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ না করার ভুঁড়ি ভুঁড়ি নিদর্শন সেসময়ের বাংলায় পাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সেসব বিধবাদের বেশীরভাগেরই ঠিকানা হত শেষে কোন পতিতালয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চমকপ্রদ এক পদক্ষেপ গৃহীত

হয়েছিল উল্লিখিত দুই বিধবার দ্বারা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধ্বজাধারী ঐ ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মণ যুবকের গর্হিত কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যেভাবে উল্লিখিত দুই বিধবা সেই সময়েও আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন সুবিচারের আশায় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে রীতিমতো ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবী করেন তার মাধ্যমে সমাজসংস্কার, স্ত্রী শিক্ষা, উন্নয়নমূলক আইন ইত্যাদির যে একটা ইতিবাচক ভূমিকা বহু সাধারণ নারী অনুধাবন করে নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর মতো সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তার জন্য কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বিধবা বিবাহ আইন বাস্তবায়নের পর আইনের প্রয়োগ নিয়ে আনন্দময়ী দেবী সহ নয়জন হিন্দু বিধবা ভারত সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। সেখানে স্পষ্টতই তাঁদের বৈধব্য জীবনের দুর্দশা প্রকাশের সাথে সাথে ইংল্যন্ড সম্রাজ্ঞীর দ্বারা বিধবা বিবাহ আইন প্রয়োগ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই আইনের বিস্তারের উদ্যোগে যে তাঁরা যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন তা পত্রে ব্যক্ত করেছিলেন এবং তার জন্য সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন। কিন্তু একইসাথে আইন বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশিত হয়েছিল আবেদনপত্রে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আবেদনকারী বিধবা মহিলারা সরকারের নিকট এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে, এই আইন যাতে যথার্থই কার্যে পরিণত হয় সেজন্য প্রতি জেলায় ইন্সপেক্টর নিয়োগ অথবা প্রতি অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিকে বেতনের বিনিময়ে একার্যে নিযুক্ত করা হোক। সাথে এই আবেদনপত্রের কথা যাতে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন তাঁরা।[৫] এই পত্র দ্বারা যেমন আইনের বাস্তবায়নে সরকারের অনীহা প্রকাশ পেয়েছে তেমন বহু বঙ্গ বিধবাই যে এই আইনকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, আইন বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে তাঁদের যে আশঙ্কা তার দ্বারা তা সহজেই প্রমাণিত। তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হল কি কি উপায়ে আইনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে তার সুফল বিধবারা ভোগ করতে পারবে সে বিষয়ে উল্লিখিত দশ জন বিধবার পরামর্শ প্রদানের প্রসঙ্গ। ১৮৫৯ সালের সমাজ, সংস্কার, মানসিকতার প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলেও এটি বাস্তবিকই অভাবনীয় ও একইসাথে যথেষ্ট ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষর বহন করে। এর দ্বারা যেমন অবশ্যই এটা প্রমাণিত হয়না যে বঙ্গদেশের সমস্ত মহিলাই এই আইনকে অন্তর থেকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, সেরকমভাবে সমস্ত বিধবাই আবার এর বিরোধী ছিলেন বা আইন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তেমনটাও যে বাস্তব চিত্র ছিলনা তাও উক্ত আবেদনপত্রের দ্বারা প্রমাণিত। এই আইন চালু হওয়ায় বাংলার বহু বিধবাই যে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন তা শ্রী বিদ্যা দেবী নামে এক বিধবার পত্র দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে লেখা পত্র থেকেই বোঝা যায় পঞ্চদশ আইন প্রণয়নের সংবাদে তিনি কতটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লেখেন-

"আমার শরীরে স্বামীসুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিন যে বাঁচিয়া থাকিব এমত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরম আনন্দে প্রানত্যাগ করিব। কারণ যদিচ আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শত শত স্বামীহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে, ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব.....রামমোহন রায় সতীগমন নিষেধ করাইয়া শারীরিক দাহ নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শারীরিক ও মানসিক দাহ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিলেন, উপরোক্ত উক্তি দৃষ্টি করিয়া অনেকে বিবেচনা করিবেন আমার উক্তি অত্যুক্তি হইয়াছে কিন্তু বস্তুতত্ত্ব বিবেচনা করিলে তাহা নহে,
"ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বিং প্রসব বেদনাং"

বন্ধ্যা যদ্রূপ পুত্রবতী কামিনীর প্রসববেদনা জানেনা সেইরূপ পুরুষ অথবা সধবা স্ত্রী বিধবাদিগের ক্লেশ জানিতে পারিবেন না?....."[৬]

এভাবে বহু অখ্যাতনামা বিধবা মহিলাও আইন প্রণয়নের পর নানাভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যারা একইভাবে আনন্দ প্রকাশের সাথে সাথে আইনের বাস্তবায়নে বিলম্ব দেখা দেওয়ায় একপ্রকার চাপা আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৭০ সালে জলপাইগুড়ির এক গ্রামে দীনতারিণী দেবী নামে এক বিধবার সাথে হরিকিশোর চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির বিবাহ সম্পন্ন হয়। ঘটনাটির উল্লেখ একারণেই প্রয়োজন যে, বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দীনতারিণী দেবীই নিজ পিতার নিকট পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে উদারমনস্ক পিতাও উদ্যোগী হয়ে কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করেন।[৭] বিধবা বিবাহ আইনের সঠিক ব্যবহার নিজ জীবনে প্রয়োগ করার মানসিকতা অনেক মহিলারই ছিল কিন্তু ভয়, লজ্জাকে পরাজিত করে নিজমুখে সেকথা পরিবারের মানুষের নিকট প্রকাশ করতে খুব কম মহিলাই সেদিন সফল হয়েছিলেন এবং যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনতারিণী দেবীর নাম অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ পত্রিকায় সম্পাদকীয় চিঠিতে এক বিধবার কথা জানা যায় যে নিজ স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য এক পুরুষের সাথে গ্রাম ত্যাগ করতে উদ্যোত হলে মহিলার আত্মীয়বর্গের তৎপরতায় 'ধৃত' হয়। আত্মীয়েরা সেই বিধবা ও তাঁর প্রেমিকের বিরূদ্ধে দুহাজার টাকা 'চুরীর' দায়ে শেষোক্তের নামে ওয়ারেন্ট বের করে গ্রেপ্তার করায় ও রমণীকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে আসা হয়। ম্যজিস্ট্রেট তাঁর কাছে পরপুরুষের সাথে গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি সকলের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় বলেন- "আমার স্বামী পরলোক গমনকালীন আমাকে কহিয়া গিয়াছেন, যদাপি তুমি একাকিনী না থকিতে পার, তবে কোন ভদ্র বংশোদ্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপবর মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার অধীনে কালযাপন করিবা। সুতরাং সেই অনুমতি অনুসারে আমি এই পুরুষকে মাল্য প্রদান করিয়া তদীয় সংসর্গে আমার গর্ভ হইয়াছে।" এভাবে মাথা উঁচু করে উল্লিখিত মহিলা কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই থামেননি, এরপর ম্যাজিস্ট্রেট ২০০০ টাকা গৃহ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুললে বিধবা ভণ্ড আত্মীয়দের বিরূদ্ধে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে জানান- "আমার স্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সংগতি কিছুমাত্র ছিলনা.....তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি ও আমার অবগন্ড সন্তানগুলি অন্নাভাবে মারা পড়িতে ছিলাম,.....এইক্ষণে যাঁহারা আমার আত্মীয় বলিয়া আমার বিপক্ষে অভিযোগ করিতেছেন, তাঁহারা আত্মীয় বটে অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু ধর্মাবতার আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার স্বামীর পরলোকগমনের পর উহারা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের বিষয়ে কোনদিন তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন? অধুনা আমাকে কষ্ট দেওয়ার নিমিত্ত দুই হাজার টাকার দাবীতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।"[৮] এভাবে এজাতীয় প্রতিবেদন থেকে যেমন কিছু মহিলার জীবনের ওপর নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানা যায় তেমনি কিছু ভণ্ড, কুটিল পরিবারবর্গ তথা সমাজের কিছু খারাপ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের একজন বিধবাকে নানাভাবে তাঁর স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো থেকে কীভাবে বিরত করা যায় বা তাতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করা যায় সে সম্পর্কে জানা যায়। বিধবা বিবাহ আইন সরকারীভাবে প্রণয়নের পূর্বেও মেদিনীপুরের কোন এক গ্রামের বিধবা মহিলারা রাজা রাধাকান্ত দেবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন। যেখানে তাঁরা বিদ্যাসাগরের পরাশর সংহিতার মাধ্যমে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তার দ্বারা মুগ্ধ ও আনন্দিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে যেভাবে সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ তাঁর বিরোধিতা করে বিধবা বিবাহ আইন প্রচলিত না হওয়ার বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন তার সমালোচনা করে তাঁরা লেখেন-

"বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারগ হয়েন নাই। কেবল তন্তুবায়দিগের ন্যায় নিরর্থক কোলাহল ও কলহ করিয়া এক এক খানি পুস্তক রচনা করিয়া আপনাপন পারগতা দর্শাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বাটীর বিধবারা অসহ্য ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম প্রতিপালনে যে অপারগ হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতেছে তাঁহারা কি একবারও নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন না?"[৯] ময়মনসিংহের সুখদা নামের এক বিধবা বালিকা পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলে পিতা তাতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় সে মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর পিতা কন্যাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার আশায় আদালতের দ্বারস্থ হন। যদিও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দাবী অগ্রাহ্য করে প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে নিজ ইচ্ছামত কার্য সম্পাদনের অধিকার দিয়েছিলেন।[১০]

পুনর্বিবাহের সুযোগ বা আইন থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বঞ্চিত হয়ে শ্বশুরালয়ে কিংবা পিত্রালয়ে গলগ্রহ কিংবা চাকরানি হিসেবে অবমাননাকর জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে কোন প্রেমিকের সাহচর্য লাভে উদ্যোগী হলে সেই বিধবার জীবনের পরিণতি ঘটত কোন বেশ্যা পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে। এমনই এক যুবতী বিধবার পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় ১৮৬৯ সালে। 'একজন বিধবা রমণী' নামে প্রেরিত এই পত্রের শুরুতে পত্রলেখিকা অনুযোগ ও আক্ষেপ করেছেন এই বলে- "বড় আশা ছিল যে কৃতবিদ্য যুবকেরা সকলে সমবেত হইয়া দেশের দুর্নীতি সকল অপনয়ন ও আমাদের পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে যত্নশীল হইবেন। কিন্তু হায়!.....তাঁহাদিগকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া আমাদের আশা এক্ষণ আকাশ কুসুম সদৃশ বোধ হইতেছে.....অপাত্রে আমাদের বিশ্বাস সংস্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণ গতানুশোচনা বৃথা।" এরপরে তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে একা পতিহীন অবস্থায় "দুর্জ্জয় পাষণ্ডগণের" ভয় প্রদর্শন ও প্রলোভন-সঙ্কুল কুপ্রস্তাবের বিরূদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন যদিও শেষপর্যন্ত একজনের ছলনায় পরাস্ত হয়েছিলেন।[১১] বিধবাদের চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রাখার অপারগতা খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা ছিল সে সময়। তবে অনেক বিধবাই এভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়লে সামাজিক রোষের কবল থেকে মুক্তি পেতে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়াকেই একমাত্র পথ বলে মনে করেছিলেন বা বলা ভাল সমাজ তাঁকে সেইভাবেই ভাবতে বাধ্য করেছিল। শান্তিপুরের কাশ্যপ পল্লীর এক বিধবা মহিলা আত্মহত্যা করেছিলেন নিজের সতীত্বের বিরূদ্ধে যে নিন্দাসূচক মন্তব্য শুরু হয়েছিল তা সহ্য করতে না পেরে। খাঁটুরা গ্রাম নিবাসী অসংখ্য বিধবা বৈধব্য যন্ত্রনাঘটিত অধর্ম্মাচরণের লোকাপবাদ সহ্য করতে না পেরে চরম পথ বেছে নিয়েছিল। তারমধ্যেই একটি তরুণ বয়স্কা ভদ্রপরিবারের বিধবা ভ্রূণহত্যা করতে অসমর্থা হয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে ভ্রূণের সাথে সহমৃতা হয়েছিলেন।[১২] ১৮৮৫ সালের কলকাতা শহরে একটি ঘটনার উপস্থাপন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কলকাতার করোনার কর্তৃক বাংলার সরকারকে লেখা একটি চিঠিতে কালী বেওয়া নামে একটি বিধবার মর্মান্তিক মৃত্যুর শোচনীয় ঘটনা উপস্থাপিত করেন যেখানে দেখা যায় কলকাতার উচ্চ বংশ ও পরিবারের কন্যা ও বধূ হওয়া সত্ত্বেও কালী বেওয়া নামে এক বিধবাকে স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমে নিজ স্বামীর গৃহ ও পরে নিজ পিতৃগৃহ হতেও বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। তারপর অনেক আত্মীয়ের বাড়ী ঘোরাঘুরির পর যখন সে তাঁর দিদির কাছে পৌঁছয় তখন সে ইতিমধ্যে সন্তান্সম্ভবা। শেষে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর পরিণতিও হয়েছিল বাকি বিধবাদের মতোই। কলকাতার করোনার সেই মৃত দেহের যে করুণ বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,-

"The body was on the floor with a bundle of dirty clothes under her head and a small piece of cloth under her waist; otherwise the deceased was quite nude. These clothes were all stained with blood. There was nothing in the house to show that deceased had any attention paid to her. There was neither food, water or an ordinary country lamp . In fact the wonder

is how the corpse escaped the ravaging attack of jackals…The body was discovered on the 25th Oct. when it was pretty well advance in decomposition."[১৩]

এই বিধবা মহিলাগণ কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও পারেননি সেই আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে, তাঁরা স্বভাবতই হয়ে উঠতে পারেননি সেই যুগের ব্যতিক্রমী মহিলাদের একজন। বিশেষতঃ কালী বেওয়ার ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তার কিছু পূর্বেই মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে 'অসতী' বিধবাদেরও অধিকার রক্ষার বিষয়টি মান্যতা পেয়েছিল তা এই ঘটনার পর করোনারের প্রতিবেদনেই স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালী বেওয়া যে সেই সম্পত্তির কোন অংশই পাননি তাও করোনারের বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "Although it was only recently decided by the High Court that a Hindu widow has a legal right to a share in the property of her deceased husband even if she be leading an unchaste life. This poor woman was literally hunted from house to house even from the ancestral dwelling of her father and the family property of her late husband."[১৪] এভাবে কোন কোন মহিলা আইনী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণে সক্ষম হননি। তাই কেউ স্বামীর সম্পত্তিতে আইনী সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আবার কেউ অবৈধ সন্তান গর্ভে এলেও সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়কে অতিক্রম করতে না পারায় পুনর্বিবাহের বদলে স্বহত্যাকেই আপন পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী তাঁদের বিরূদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা বেশীরভাগ বিধবাদের কাছেই ছিল অভাবনীয়। ইচ্ছা থাকলেও সঠিক উপায়ের অভাব বা সেই উপায়ের বাস্তবায়নের পথ বেশীরভাগ বিধবাই সেদিন খুঁজে পাননি, তাই পঞ্চদশ আইন ও তার প্রয়োগ তাঁদের জীবনে কেবলমাত্র 'আইন' হিসেবেই থেকে গিয়েছিল।

এদিকে সমাজের সকল মহিলাই যে বিধবা বিবাহ আইনকে সমান দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেননি তার নিদর্শনও কম ছিলনা। বিদ্যাসাগরের কন্যাসম বিধবা শিবমোহিনী দেবীও যখন বিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে বিধবাভোজন করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন তা কুসংস্কারপ্রিয় বিধবাদের আপত্তি এবং অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৫] ইন্দুমতী দেবীর বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হলে বালিকা ইন্দুমতী প্রথমে এব্যাপারে কিছু না বুঝলেও এবং সধবা মহিলার সমস্ত প্রতীক ব্যবহার করলেও একদিন ঘোষেদের মেয়ে এসে যখন বলেছিল, "তোর ভাতার মরেচে। ১২/১৪ বছরের ধাড়ি হলি, একাদশী করবি কবে? মা তো খুব সোহাগিনী সাজিয়ে রেখেছে। সিঁদুর পরাবে কবে লো?" তারপরেই বিধবা ইন্দুমতী গয়না-শাড়ী পরিত্যাগ করে বাড়ির বিশু নাপিতকে "মাথাটা মুড়িয়ে" দেওয়ার আবদার করেছিলেন।[১৬] প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন ইন্দুমতী দেবীর বাড়ীর লোক কিন্তু তাঁদের বাল্য বিধবা কন্যাকে কোন কঠোর ব্রত পালন বা অমানবিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে বাধ্য করেননি, এক্ষেত্রে বালিকা ইন্দুমতী দেবীর মধ্যেই হিন্দু সমাজের অন্ধ বিশ্বাস এতটা তীব্রভাবে মনের ভিতর বাসা বেঁধেছিল যে সেগুলিকে উপেক্ষা বা অবমাননা করার কথা সে ভাবতেই পারেনি। যেমন ভাবতে পারেননি সাড়ে এগারো বছর বয়সে বিধবা হওয়া জ্ঞানদাসুন্দরীও। মোটে দু তিনবার চোখে দেখা স্বামীর মৃত্যুর পর একাদশী ব্রত গ্রহণ করার পর থেকে যে কঠোর বৈধব্য জীবন তিনি শুরু করেছিলেন সেখানে ছিলনা শীতকালে গায়ে চাদর দেওয়ার নিয়ম, তাইতো বৃদ্ধাবস্থায় চাদর নেওয়ার কথা বলতে তাঁর স্বীকারোক্তি- "বিধবার শীত করেনা"। কখনও নিজ সন্তান না হওয়ার দুঃখ মনে আনাও পাপ মনে করতেন জ্ঞানদাসুন্দরীর মত বিধবারা কারণ তাঁর মতে, "আমি যে বিধবা! ছিঃ ওসব কথা কি মনে আনতে আছে?", "বিধবার অত গোলগাল গড়ন ভালো নয়", "রাতে বিধবাকে সামান্য খেতে হয়", "জামা কি জুতো আমি জন্মেও পরিনি। ওসব কথা ভাবলেও পাপ।

গেল জন্মে কত অত্যাচার অনাচার ক'রে সেই পাপে আজন্ম বিধবা, আবার আগু বাড়িয়ে অন্যায় ক'রে নিজের মরণ ডেকে আনব?"[১৭] বিধবাকে খেতে নেই, ছুতে নেই, দেখতে নেই- এজাতীয় বুলিই ছিল জ্ঞানদাসুন্দরীর মত সেযুগের বেশীরভাগ বিধবাদের প্রতি মুহূর্তের সাথী। এঁরা সামাজিক কুপ্রথার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা দূর, তার বিরূদ্ধে প্রশ্ন করার ইচ্ছে পর্যন্ত প্রকাশ করেননি কখনো।[১৮] ১৮৯০ সালের এক বিধবার করুণ পরিণতির কথাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। বৈধব্য প্রাপ্তির পর গর্ভাবস্থায় সেই বাল বিধবা বাপের বাড়ী এলে বৈধব্য জীবনের সমস্ত নিয়মকানুন মানতে তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও প্রতি মাসের দুটি একাদশীতেও তাঁকে নিস্তার দেওয়া হয়নি। অদৃষ্টের পরিহাসে এক গ্রীষ্মের একাদশীর রাতেই তাঁর প্রসব বেদনা উঠলে সে জলের জন্য ছটপট করতে থাকলেও, বারবার জল চাওয়া সত্ত্বেও আগামী জন্মে মেয়ের পুনরায় বৈধব্যের আশঙ্কা করে মা তাঁকে জল দিতে পারেননি। ফলে দ্বাদশীর দিন সকালে মেয়েটি এক মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করে।[১৯] এক্ষেত্রে এই বিধবা মেয়েটি কিন্তু তাঁর নিজ পিতা মাতার বিরূদ্ধাচারণেও সফল হয়নি বা বলা ভাল হয়ত সেই চেষ্টাই সে কখনো করেনি। তাঁর নিজ জীবন বা আগত সন্তানের কথা ভেবে সে চাইলে সেটা করতেই পারত কিন্তু পিতা-মাতার নির্দেশ তথা শাস্ত্রীয় নিয়ম ও দেশাচারের উর্দ্ধে উঠে তা করতে সক্ষম হয়নি সে যার মূল্য হিসেবে তাঁর সন্তানের প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল।

বিধবা বিবাহ আইন অবশ্যই বৈধব্য সমস্যার যে সমাধান করেনি বা সকল বিধবাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেনি তা ১৮৮৫ সালের কালী বেওয়াদের মত ঘটনার অস্তিত্বের মাধ্যমেই প্রমাণিত। সেক্ষেত্রে সকলেই যে একই পথে আইনের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন তা নয়, তবে পদ্ধতিগত ভিন্নতা কিন্তু কোথাও তাঁদের জীবনে আইনের প্রয়োগের প্রয়াসকে খাটো করে দেয়না। একজন বিধবা স্বইচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করছে তাও আবার উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজে- যা সমসাময়িক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে হয়তো অভাবনীয় একটি বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। প্রতারিত হয়েও একজন বিধবা রমণী আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে, এটাই বা কম গুরুত্বপূর্ণ কিসের! তাই এটা ঠিক যে যাঁদের জন্য এই আইনী সংস্কারের প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল আইনটি প্রণয়নের পূর্বে তাঁদের মতামত গ্রহণের কোনরকম উদ্যোগ ব্রিটিশ বা ভারতীয় কোন পক্ষই না নিলেও আইন প্রণীত হওয়ার পর কিন্তু বাংলার বহু মহিলাই যে এই আইনটি সম্পর্কে নিজেদের নিজের নিজের মত করে নিজেদের জীবনে প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন তা যথেষ্ট সাধুবাদযোগ্য যদিও সকল বিধবাই যে এই আইনী প্রয়াসকে মেনে নিতে পারেননি তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

তথ্যসূত্র:

১। সংবাদ প্রভাকর, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ সাল, মঙ্গলবার, ৫৬৭২ সংখ্যা।

২। বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১২৭১ বঃ, ১৯ সংখ্যা।

৩।এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ৮ই আশ্বিন, ১২৭৭ সাল, শুক্রবার, ২৪ সংখ্যা।

৪। সম্পাদকীয়, সম্বাদ ভাস্কর, ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫৬ সাল, ৯৮ সংখ্যা, বিনয় ঘোষ (সম্পা. ও সঙ্ক.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০-১৯০৫ (তৃতীয় খণ্ড)* (কলকাতাঃ বীক্ষণ, ১৯৬০), পৃ.৩৪৩।

৫। General Department, Miscellaneous Branch, Proc. No. 81, 24th March, 1859, West Bengal State Archives.

৬। প্রেরিত পত্র, সম্বাদ ভাস্কর, ২১শে আগস্ট, ১৮৫৬ সাল, ৫৭ সংখ্যা, প্রাগুক্ত নং ২০, পৃ.৪৮৩-৪৮৪।

৭। অমৃত বাজার পত্রিকা, ২২শে চৈত্র, ১২৭৬ সাল, বৃহস্পতিবার, ৩য় ভাগ, ৬ সংখ্যা।

৮। সম্পাদকীয়, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, ১লা শ্রাবণ, ১২৭৬ সাল, ৪২৯ সংখ্যা।

৯। "বিধবা বিবাহ", সংবাদ প্রভাকর, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২ সাল, বিনয় ঘোষ (সং. ও সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১৮৪০-১৯০৫* (চতুর্থ খণ্ড) (কলিকাতাঃ পাঠভবন, ১৯৬০) পৃ.৭৬৯-৭৭০।

১০। বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১২৯৩ সাল, ৩য় ভাগ, ২৫৮ সংখ্যা।

১১। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *অশ্রুত কণ্ঠস্বরঃ ঔপনিবেশিক বাংলার বারবনিতা সংস্কৃতি* (কলকাতাঃ সুবর্ণরেখা, ২০১৪) পৃ.৫৬।

১২। বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১২৭৭ বঃ, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৮৩ সংখ্যা।

১৩। Judicial Dept., Judicial Br., File No.343, Proc. Nos.B.334-335/ January,1886, West Bengal State Archives.

১৪। ঐ।

১৫। কল্যাণী দত্ত, *পিঞ্জরে বসিয়া* (কলকাতাঃ স্ত্রী, ১৯৯৫), পৃ.২।

১৬। ঐ, পৃ.১৩।

১৭। ঐ, পৃ.২০-২১।

১৮। ঐ, পৃ.২১।

১৯। ঐ, পৃ.২৩।